অহিংসা (Non-violence)

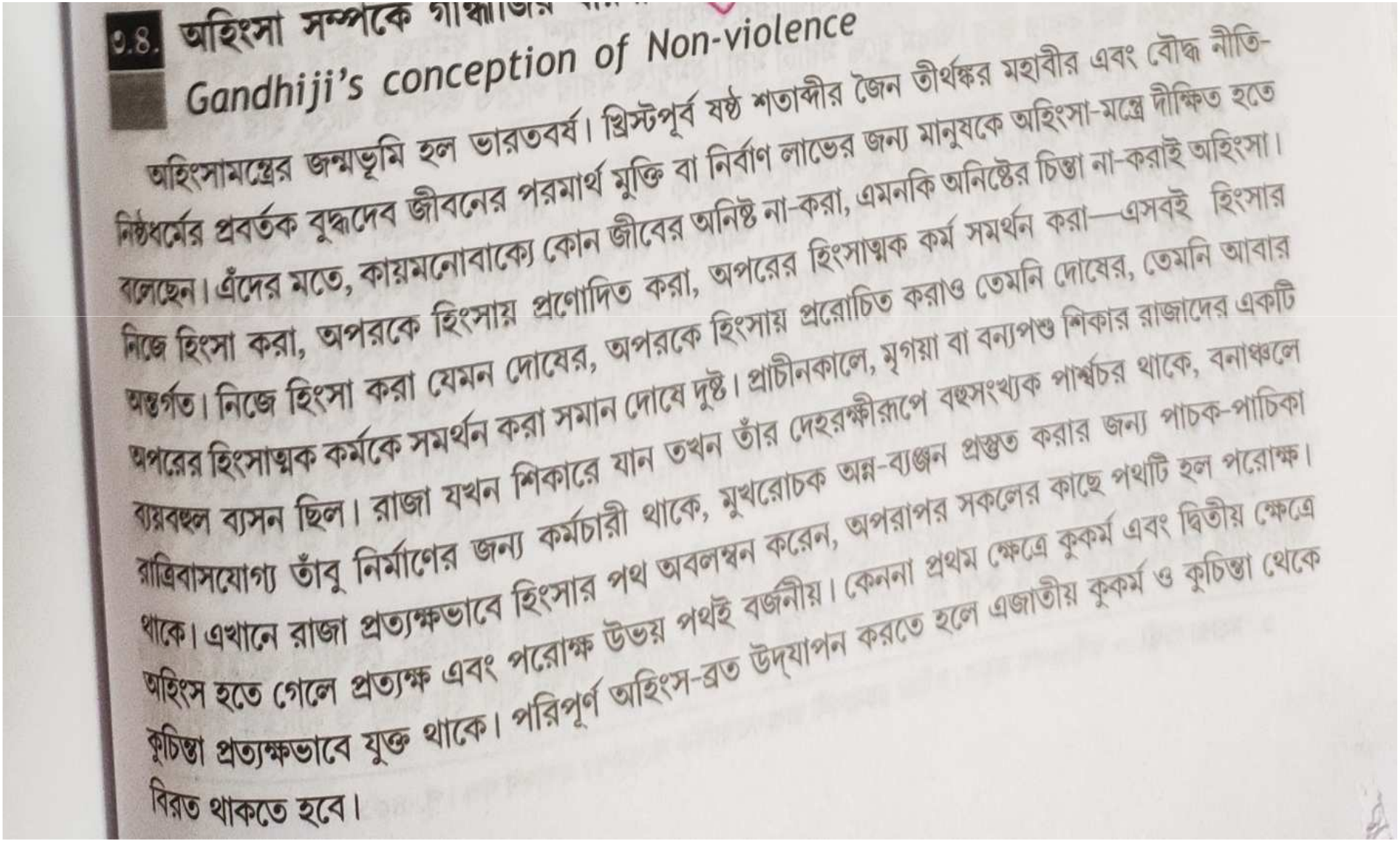

৩.৪. অহিংসা সম্পর্কে গান্ধীজির ... Gandhiji's conception of Non-violence

অহিংসামন্ত্রের জন্মভূমি হল ভারতবর্ষ। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর এবং বৌদ্ধ নীতি-নিষ্ঠধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেব জীবনের পরমার্থ মুক্তি বা নির্বাণ লাভের জন্য মানুষকে অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত হতে বলেছেন। এঁদের মতে, কায়মনোবাক্যে কোন জীবের অনিষ্ট না-করা, এমনকি অনিষ্টের চিন্তা না-করাই অহিংসা। নিজে হিংসা করা, অপরকে হিংসায় প্রণোদিত করা, অপরের হিংসাত্মক কর্ম সমর্থন করা—এসবই হিংসার অন্তর্গত। নিজে হিংসা করা যেমন দোষের, অপরকে হিংসায় প্ররোচিত করাও তেমনি দোষের, তেমনি আবার অপরের হিংসাত্মক কর্মকে সমর্থন করা সমান দোষে দুষ্ট। প্রাচীনকালে, মৃগয়া বা বন্যপশু শিকার রাজাদের একটি ব্যয়বহুল ব্যসন ছিল। রাজা যখন শিকারে যান তখন তাঁর দেহরক্ষীরূপে বহুসংখ্যক পার্শ্বচর থাকে, বনাঞ্চলে রাত্রিবাসযোগ্য তাঁবু নির্মাণের জন্য কর্মচারী থাকে, মুখরোচক অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করার জন্য পাচক-পাচিকা থাকে। এখানে রাজা প্রত্যক্ষভাবে হিংসার পথ অবলম্বন করেন, অপরাপর সকলের কাছে পথটি হল পরোক্ষ। অহিংস হতে গেলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় পথই বর্জনীয়। কেননা প্রথম ক্ষেত্রে কুকর্ম এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কুচিন্তা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে। পরিপূর্ণ অহিংস-ব্রত উদ্‌যাপন করতে হলে এজাতীয় কুকর্ম ও কুচিন্তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

আবার, এঁদের মতে, **অহিংসার কেবল নেতিমূলক দিকই নেই, ইতিমূলক দিকও আছে।** কেবল অপরের ক্ষতি না করাটাই অহিংসা নয়, সর্বজীবে প্রেম বিতরণ এবং হিতকর কর্মানুষ্ঠানও অহিংসার অন্তর্গত। সর্বজীবে প্রেম ও ভালবাসা বিতরণের মাধ্যমে এবং কল্যাণকর্ম সাধনের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের পরিপূর্ণতা লাভের বাসনা চরিতার্থতা লাভ করতে পারে— জৈন ও বৌদ্ধ, এই দুটি মানবতা ধর্মে এই কথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

অন্যূন প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবদরদী গান্ধীজিও অনুরূপভাবে মানুষকে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হতে বলেছেন,—অহিংসা, মৈত্রী ও প্রেম-ভালবাসার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কল্যাণকর্ম করতে বলেছেন। **প্রাচীন অহিংসা-মন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীজির অহিংসা-মন্ত্রের মূল পার্থক্য** একটাই এবং সেখানেই তাঁর অভিমতের স্বকীয়তা ও অভিনবত্ব। প্রাচীন জৈন ও বুদ্ধমতে, **জীবের (মানুষের) পরমার্থ মুক্তি** বা নির্বাণলাভের মার্গ (পথ) হল অহিংসা পথ। গান্ধীজি **সমাজকল্যাণ সাধনকেই মানুষের পরমার্থরূপে** গণ্য করে বলেছেন যে, অহিংসা পথেই কেবল ঐ অভীষ্ট লাভ করতে হবে— হিংসার পথ ধরে সমাজের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে না। অর্থাৎ, **ব্যক্তি-মানুষের** পরমার্থিক মোক্ষ বা মুক্তিলাভের পথ-হিসাবে নয়, বাস্তব সমাজের, **সমাজস্থ সব মানুষের মোক্ষ বা মুক্তিলাভের হিসাবে নয়, বাস্তব সমাজের, সমাজস্থ সব মানুষের সার্বিক কল্যাণ** (সর্বোদয়) সাধনের জন্যই গান্ধীজি অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অপরকেও ঐ পথ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। আরও সহজভাবে বলা যায়— প্রাচীন মত অনুসরণ করে **গান্ধীজি অহিংসা-পথকে ব্যক্তি-কর্মকেন্দ্রিক বলেননি, গোষ্ঠী-কর্ম কেন্দ্রিক বলেছেন**—গোষ্ঠীগতভাবে প্রতিবাদের পথই হল অহিংসপথ। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের অর্থাৎ গোষ্ঠীর এই প্রতিবাদ পরাধীন দেশের বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে হতে পারে, আবার স্বাধীন দেশের স্বদেশী শাসকদের বিরুদ্ধেও হতে পারে। তবে, গান্ধীজির অভিমত হল, **বিদেশী অথবা স্বদেশী নির্বিশেষে প্রতিবাদটিকে হতে হবে অহিংসার রাজপথে, হিংসার চোরাপথে নয়।** গান্ধীজি অবশ্য অহিংসার মাত্রাভেদ স্বীকার ক'রে এমনও বলেছেন যে, **ক্ষেত্রবিশেষে পথটি উগ্র অথবা কোমল হতে পারে।** বিদেশী শাসকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পথটি উগ্র হতে পারে, যদিও স্বদেশী শাসকদের দুর্নীতির প্রতিবাদে পথটিকে হতে হবে নম্র।

গান্ধীজি-সম্মত অহিংসাপথ অবলম্বন সুকর নয়, দুষ্কর, কেননা তা ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠার পথ, সত্যাগ্রহের পথ। সত্যের প্রতি অবিচল আগ্রহ না থাকলে এই পথ অবলম্বন করা যায় না। **এই পথ তাই কাপুরুষ ও চরিত্রহীনের সশস্ত্র পথ নয়, এই পথ নির্ভীক ও চরিত্রবানের নিরস্ত্র পথ।** নির্ভীক ও চরিত্র বলে বলীয়ানই কেবল তার ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠাকে হাতিয়ার করে অত্যাচারী সশস্ত্র কাপুরুষের সম্মুখীন হতে পারে এবং প্রয়োজন হলে অকুতোভয়ে ও অবিচলিত চিত্তে আত্মোৎসর্গ করতে পারে। অহিংসা-যুদ্ধ এক ধর্মযুদ্ধ, সত্যধর্মে বলীয়ান হয়ে যুদ্ধ। এই যুদ্ধের যে অনুশাসন, 'মরব তবু মারব না, এবং এই করেই জয়ী হব—এ একটা মস্ত বড় কথা, একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা কার্যোদ্ধারের বৈষয়িক পরামর্শ নয়। ধর্মযুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নয়, হেরে গিয়েও জয় করার জন্য। অধর্ম যুদ্ধে মরাটা মরা। ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে, হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত'।[১]

গান্ধীজি বিশ্বাস করেন যে সশস্ত্র হিংসার পথে শত্রুকে জয় করা যায় না, কেবল দমিত করা যায়। দমন-পীড়নে হিংসার নিবৃত্তি হয় না, বরং তা বৃদ্ধি পায়। **অহিংসা পথের আবেদন প্রতিপক্ষের পশু-প্রকৃতির কাছে নয়, তা হল মানবতার কাছে, বিবেকবুদ্ধির কাছে।** অহিংসা-পথে প্রতিপক্ষের বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করা হয়, তার অন্তরকে কলুষমুক্ত করা হয় এবং পরিণামে প্রতিপক্ষের অন্তরে বৈরীভাব অন্তর্হিত হলে উভয়পক্ষ প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ প্রকার অহিংসা পথেই কেবল প্রতিপক্ষীয়দের অন্তরশুদ্ধি ঘটিয়ে তাদের ন্যায় ও সত্যের পথে চালিত ক'রে সমাজের সার্বিক কল্যাণসাধন সম্ভব হয় অর্থাৎ সর্বোদয় প্রতিষ্ঠা পায়, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে, ক্ষেত্রবিশেষে গান্ধীজি অহিংসা পথেও অস্ত্র ব্যবহারকে প্রয়োজনীয় বলেছেন, **যেখানে অস্ত্রের ব্যবহার অহিংসার বিশুদ্ধতাকে বিনষ্ট করে না।** অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির লক্ষ্য যদি হয় সত্য ও ন্যায়ের রক্ষা এবং

প্রতিষ্ঠা, তাহলে চোখের সামনে তাদের পদদলিত হতে দেখলে সত্যাগ্রহীকেও অস্ত্রধারণ করতে হয়। কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে কেউ নির্মমভাবে আঘাত করছে, এমন দেখলে, — কোন স্ত্রীলোকের সম্মানহানি করতে কেউ উদ্যত হয়েছে, এমন দেখলে,—কোন ব্যক্তিকে কোন ঘাতক হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, এমন দেখলে, অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত সত্যাগ্রহীরও অস্ত্রধারণের প্রয়োজন হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অহিংসাব্রতী গান্ধীজি, ক্ষেত্রবিশেষে জীবহত্যাকেও উচিতকর্ম বলেছেন। অনারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন যেখানে নিরন্তর অসহ্য ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত, যন্ত্রণা-উপশমের কোন সম্ভাবনা যেখানে নেই, সেখানে অহিংসাব্রতীর উচিত কাজ হবে তাকে হত্যা করা। এমন ব্যথা-বেদনা জর্জরিত একটি কুকুরের প্রাণনাশের জন্য গান্ধীজি নিজেই তাঁর অনুচরবৃন্দকে নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজি এখানে করুণা হত্যা বা সদয় হত্যাকে (euthanasia-কে) সমর্থন করার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

গান্ধীজির মতে, 'সর্বোদয়' সমাজের আদর্শ, আর ঐ আদর্শ লাভের উপায় হল অহিংস-অস্ত্র— সত্যাগ্রহ। অহিংস-অস্ত্র সত্যাগ্রহ, গান্ধীজির মতে, কল্যাণ-বিধায়ক নৈতিক-অস্ত্র— অস্ত্রহীন সত্যনিষ্ঠ বীরের অস্ত্র। এই সত্যাগ্রহ বা অহিংস-পথের দুটি প্রকার আছে—**আক্রমণাত্মক উগ্র পথ এবং শোধনাত্মক সৌম্য পথ**। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে, ইংরেজ শাসনের অবসানের জন্য, গান্ধীজি অহিংসার উগ্র পথটিকে গ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে অথবা লবণ আন্দোলনে আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রয়োজনীয় হওয়ায় গান্ধীজি সেক্ষেত্রে অহিংসার উগ্র পথটিকে অবলম্বন করেন। এ প্রসঙ্গে গান্ধীজির আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী ও ভূদানযজ্ঞের প্রবর্তক আচার্য বিনোবা ভাবে বলেন, 'স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা ছিল চাপ প্রয়োগ করিয়া ইংরেজদের রাজশক্তি ধ্বংস করিবার নেগেটিভ (নিষেধাত্মক বা আক্রমণাত্মক) পথ[১]। ইংরেজের নাগপাশ ছিন্ন করে যথাসম্ভব শীঘ্র স্বাধীনতা লাভ করা প্রয়োজন ....এই অবস্থায় সত্যাগ্রহের (অহিংস পথের) ঐ উগ্র ও নিষেধাত্মক প্রক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছিল।'[২]

কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সত্যাগ্রহ বা অহিংস-অস্ত্র নিষ্প্রয়োজনীয়। 'গান্ধীজি ইংরেজদের বলিলেন 'ভারত ছাড়' আর তাহাদের ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইল। কিন্তু আমরা নিজেদের দেশের পুঁজিপতি বা জমির মালিকদের ঐভাবে 'ভারত ছাড়' বলিতে পারি না। সুতরাং এখন যে সত্যাগ্রহ (বা অহিংস আন্দোলন) তাহা.....নিষেধাত্মক (নেগেটিভ) হইতে পারে না'[৩] এখন প্রয়োজন শোধনাত্মক সৌম্য অহিংস পথ অনুসরণ করে দেশের পুঁজিপতি ও জমি মালিকদের হৃদয়-পরিবর্তন বা চিত্ত-সংশোধন। উগ্র অহিংস-পথের অনুশাসন হল 'মেণ্ড অর এণ্ড' (mend or end) অর্থাৎ 'হয় তুমি নিজেকে নমনীয় কর, নচেৎ নিপাত যাও', কিন্তু সৌম্য অহিংস-পথের অনুশাসন হল 'নিজেকে সংশোধন কর' (reform yourself)। **স্বাধীন ভারতে এই সৌম্য অহিংসপথকেই গান্ধীজি অনুসরণীয় বলেছেন,** যদিও তাকে কার্যকর দেখে যেতে পারেননি। 'ভারত ছাড়' অহিংস-সংগ্রামের অবসানের পর গান্ধীজি ১৮ দফা কর্মপন্থা এবং ততোধিক উপায়ে (সৌম্য অহিংস উপায়ে) জনসেবার জন্য নির্দেশ দেন। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর গান্ধীজির সভাপতিত্বে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী সেবাগ্রামে সত্যাগ্রহী লোকসেবকদের এক সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে জানুয়ারী এক আততায়ীর গুলিতে গান্ধীজির কর্মবহুল ও ঘটনাবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সংস্কার সাধনের জন্য গান্ধীজি যে সৌম্য সংশোধনাত্মক অহিংস পথের কথা বলেন, **সমাজদর্শন ও রাষ্ট্র দর্শনে গান্ধীজির সেই সৌম্য অহিংস-নীতিই মুখ্য আলোচ্য বিষয়।** অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে 'হরিজন আন্দোলনে' গান্ধীজি সৌম্য অহিংস পথকে গ্রহণ করে বলেন যে, অসামাজিক মানুষের (অস্পৃশ্যজ্ঞানে মানুষকে ঘৃণা করা অসামাজিক মানুষের বাজ) কার্যাবলী রোধ করার জন্য, তাদের অন্তর-শোধনের দ্বারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে, বলপ্রয়োগের দ্বারা যা সম্ভব হবে না। হিংসার দ্বারা

সমাজের দুষ্কৃতির অবসান ঘটানো যায় না। **হিংসার দ্বারা শীঘ্র দুষ্টকে দমন করা গেলেও তা সাময়িক, পরিণামে দুষ্টতা বাড়ে।** সমাজবিরোধীকে কারাদণ্ড দিলে অথবা হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিলে সমাজবিরোধিতা বা নরহত্যা হ্রাস পায় না, বরং বৃদ্ধি পায়। দমন-পীড়নের মাধ্যমে দুষ্টের দমন সব দেশেই ব্যর্থ হয়েছে। সমাজে দুষ্কৃতির অবসান ঘটানোর জন্য গান্ধীজি তাই তাঁর বৈপ্লবিক অহিংস-পথের (সৌম্য পথের) নির্দেশ দিয়েছেন। **মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অহিংস উপায়ে দুষ্টের অন্তর শুদ্ধি করা গেলে তবেই স্থায়ীভাবে অপকর্ম রোধ করা সম্ভব হতে পারে।** এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সত্যনিষ্ঠা, চরিত্রবল এবং প্রয়োজনে আত্মদান। অহিংস-মন্ত্রে দীক্ষিত গান্ধীজি মনে করেন যে, কোন পাপীর অথবা পাপকর্মের এমন শক্তি নেই যা সত্যাগ্রহীর অহিংস-বলকে, আত্মত্যাগকে পরাভূত করতে পারে। কাজেই, **গান্ধীজির মতে, সমাজের গঠনের জন্য, সমাজের সংস্কার সাধনের জন্য, প্রকৃষ্ট উপায় হল— অহিংসার দ্বারা দুষ্টের স্বভাব পরিবর্তন ও তার চরিত্র সংশোধন।**

গান্ধীজির মতে, সমাজ-সংস্কারের **প্রথম ও প্রধান ধাপ হল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ,** কেননা দীর্ঘকাল ধরে অস্পৃশ্যতার অন্ধ-কুসংস্কার ভারতীয় সামাজিক পরিবেশকে দূষিত ও কলুষিত করেছে, মূল শূদ্র-শক্তিকে অবহেলা করে সমাজশক্তিকে নিদারুণভাবে দুর্বল করেছে। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে অথবা দর্শনে কোথাও অস্পৃশ্যতার উল্লেখ নেই— অস্পৃশ্যতা, কিছু সুযোগ-সন্ধানী কপট মানুষের সৃষ্টি। উপনিষদ বলেন, 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ 'তুমিই সেই'— তোমার মধ্যেই (অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে) আছে ঐশীশক্তি। বুদ্ধদেব বলেন, 'আত্ম দীপঃ ভবঃ' অর্থাৎ 'প্রত্যেকে অগ্নিশিখার মতো প্রজ্বলিত হয়ে ওঠো— প্রত্যেকের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে অনন্ত সূর্যশক্তি'। জৈনরা বলেন, প্রত্যেক মানুষের 'জিন্' বা সিদ্ধপুরুষ হবার সামর্থ্য আছে। স্পষ্টতই, ভারতীয় ধ্যান ধারণায় মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ স্বীকৃত হয়নি। ভারতীয় বিশুদ্ধ ধর্মদর্শন চিরকাল সমাজবদ্ধ মানুষকে একত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছে, আর অস্পৃশ্যতারূপ অধর্ম ভারতীয় **সমাজকে ছিন্নভিন্ন ও দুর্বল করেছে। যা সমাজকে সম্বদ্ধ করে তাই ধর্ম, আর সমাজকে যা খণ্ডিত করে তা অধর্ম। গান্ধীজি তাঁর অহিংসা-মন্ত্রে সমাজকে তার 'ধর্ম' পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, অস্পৃশ্যতাকে স্বীকার করে অধর্ম পালনের নির্দেশ দেননি।**

গান্ধীজি নির্দেশিত অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হলে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের মধ্যে, সবল-দুর্বলের মধ্যে, ধনী ও নির্ধনের মধ্যে, ভূম্যধিকারী ও ভূমিহীনদের মধ্যে, এক কথায় মানুষের সঙ্গে মানুষের, কোন বৈরী মনোভাব থাকে না— স্পৃশ্য অস্পৃশ্যকে, সবল দুর্বলকে, ধনী নির্ধনকে, ভূম্যধিকারী ভূমিহীনকে, এক কথায় মানুষমাত্রই মানুষকে, আত্মার আত্মীয়জ্ঞানে আলিঙ্গন করে। অহিংস পন্থায় এমন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাই সর্বোদয় আদর্শ এবং এপ্রকার সমাজ ব্যবস্থাকেই গান্ধীজি 'স্বরাজ' বলেছেন, 'রামরাজ্য' বলেছেন। **অহিংস-পথে, ভারতবর্ষের বহুযুগব্যাপী অন্ধতা ও মূঢ় আচার- বিচারের অবসান ঘটিয়ে, প্রত্যেক মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাই হল গান্ধীজি সম্মত স্বরাজ প্রতিষ্ঠা বা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা।**

সমালোচনা (Criticism)

একথা ঠিক যে, হিংসার পথে, দমন-পীড়নের মাধ্যমে, দুষ্ট ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে দমিত করা গেলেও দুষ্টতার অবসান ঘটে না, সুযোগমতো দুষ্টব্যক্তি তার দুষ্টতাকে পূর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রকাশ করে। অহিংস-পথেই দুষ্টের বিবেকবুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়ে তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো যায় এবং তার দুষ্টতারও অবসান ঘটানো সম্ভব হয়। তবে,**অহিংস-পথে এপ্রকার চরিত্র-সংশোধন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সম্ভব হতে পারে, গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নয়।** অহিংস-পথে বিশেষ কোন ভূম্যধিকারীর হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে কিছু পরিমাণ জমি ভূমিহীনদের দান করতে সম্মত করানো যায়, সমস্ত ভূম্যধিকারীর অন্তরের পরিবর্তন ঘটিয়ে ঐ কাজে সম্মত করানো সম্ভব হয় না।

তেমনি আবার, অহিংস-পথে যুদ্ধের মতো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া যায় না, কেননা অহিংস-পথে শত্রুপক্ষের প্রত্যেকের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন সম্ভব হতে পারে না। অহিংস-পথ অবলম্বন করে নিরস্ত্রভাবে সশস্ত্র শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হলে মৃত্যু অনিবার্য, এবং ঐভাবে মৃত্যুবরণে কোন গৌরব নেই। ঐভাবে মৃত্যু অপরিণামদর্শী মূর্খের মৃত্যু, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় সত্যাগ্রহীর আত্মত্যাগ নয়।

তাছাড়া, **অহিংসার আবেদন মানুষের বিবেকবুদ্ধির কাছে, তার মনুষ্যত্ববোধের কাছে, গর্দভের বিবেকসম্পন্ন নরপশুর কাছে নয়।** কিন্তু প্রত্যেক সমাজে এমন কিছু নরপশু থাকে যারা নিজেদের পশুবৃত্তিকে চরিতার্থ করার

জন্য নির্বিচারে নরহত্যা করে, পরের সম্পদ লুণ্ঠন করে, অপরের গৃহে অগ্নিসংযোগ করে, স্ত্রীলোকের ওপর বলাৎকার করে, অপরের সন্তান চুরি করে তাদের উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে। এদের চিত্ত-সংশোধন অহিংস-পথে সম্ভব হতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে হিংসার পথ ধরে দুর্বৃত্তকে দমন-পীড়নের প্রয়োজন হয়।

গান্ধীজির অহিংস-পথের তাই তত্ত্বগত মূল্য থাকলেও ব্যবহারিক মূল্য তেমন নেই। সমাজের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে অহিংস পথ অকেজো। দুষ্টকে কেবলই দমন-পীড়নের মাধ্যমে যেমন ইষ্ট লাভ হয় না, তেমনি অহিংস-পথে তাকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকার আবেদন করলেও ইষ্ট লাভ হয় না। সমাজকল্যাণ সাধনের পথটি বাস্তব সমাজের প্রেক্ষিতেই নির্ধারণ করতে হবে। কাজেই, এমন বলাই সমীচীন হবে যে, সমাজকল্যাণ সাধনের পথটি হবে ক্ষেত্রবিশেষে ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli) এবং হবস্ (Hobbes) সম্মত হিংসার পথ— দমন-পীড়নের পথ, আবার ক্ষেত্রবিশেষে তা হবে গান্ধীজি সম্মত অহিংস-পথ।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ